Vol. II, Issue-I, 2022

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY

PEER REVIEWED

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ - মানবিক মুখের সন্ধানে

সবরি সেন

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের শেষে রেনেসাঁর কাল হল ভাববাদকে সরিয়ে রেখে যুক্তিবাদের প্রসারের কাল। এই সময়ে বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে যে নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু প্রায় এক যুগের ব্যবধান হলেও একই সারিতে বসতে পারেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীরাও। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মান ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। বলাবাহুল্য, এঁরা সবাই ছিলেন যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে। এঁরা বেঁচেছিলেন দৈনন্দিন হিসেব-নিকেশের বাইরে, মননের তাগিদে ।

আজ যখন লোভ, স্বার্থের হানাহানি ক্ষমতার ঢক্কানিনাদে চারিদিকের বাতাস ভারী হয়ে আসে তখন খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে তাঁদের প্রয়োজনীয়তা আরো একবার বড় বেশি বলে মনে হয়। এই লেখা মূলতঃ বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। এই দুজনের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য বোধ হয় এটাই যে, বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় নিতান্তই গ্রাম্য পরিবেশে অসীম দারিদ্র্যতার মধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, বেড়ে উঠেছেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই মহাপুরুষের জীবনের মূল সুর কোথায় যেন একই তারে বাঁধা হয়ে আছে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য মূলতঃ সেই সুরটিকে খুঁজে পাওয়া।

মধ্যযুগের শেষে রেনেসাঁর কাল হল ভাববাদকে সরিয়ে রেখে যুক্তিবাদের প্রসারের কাল। এই সময়ে বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে যে নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু প্রায় এক যুগের ব্যবধান হলেও একই সারিতে বসতে পারেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীরাও। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মান ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ

বছর। বলাবাহুল্য, এঁরা সবাই ছিলেন যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে। এঁরা বেঁচেছিলেন দৈনন্দিন হিসেব-নিকেশের বাইরে, মননের তাগিদে ।

আজ যখন লোভ, স্বার্থের হানাহানি ক্ষমতার ঢক্কানিনাদে চারিদিকের বাতাস ভারী হয়ে আসে তখন খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে তাঁদের প্রয়োজনীয়তা আরো একবার বড় বেশি বলে মনে হয়। এই লেখা মূলতঃ বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। এই দুজনের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য বোধ হয় এটাই যে, বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় নিতান্তই গ্রাম্য পরিবেশে অসীম দারিদ্র্যতার মধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, বেড়ে উঠেছেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই মহাপুরুষের জীবনের মূল সুর কোথায় যেন একই তারে বাঁধা হয়ে আছে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য মূলতঃ সেই সুরটিকে খুঁজে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ "বিদ্যাসাগরচরিত" এ বলেছিলেন, "আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না তিনি দ্বিগুণ জীবিত ছিলেন।" স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির ধারক ও বাহক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধন ও বাংলা ভাষার মাধুর্য সৃষ্টিকারী বিদ্যাসাগরের প্রভাব স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল। বিদ্যাসাগর গতানুগতিক ছিলেন না, তাঁর অনন্যতন্ত্রতার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর দৃঢ় মনুষ্যত্বের আদর্শ রূপে প্রস্ফুটিত চরিত্রের মধ্যে।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এসে গোলদিঘির সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন নয় বছর বয়সে ১৮২৯ সালের ১লা জুন। তিনি লিখেছেন, "১৮২৯ খ্রীষ্টীয় সনে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী রূপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্বে আমার সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া ওই শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি।"১ কলকাতায় বিদ্যাসাগর তাঁর পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে থাকতেন বড়বাজারের দয়েহাটায় ভাগবত চরণ সিংহের গৃহে। দয়েহাটায় থাকাকালীন রাত্রিবেলা সবাই

যখন ঘুমিয়ে পড়তো, তখন গৃহের একটি নির্জন কক্ষে বসে তেলের প্রদীপের আলোয় তাঁকে সংস্কৃত ভাষার কঠোর বুনিয়াদ প্রায় অবোধ্য "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হতো। প্রসঙ্গতঃ এখানে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষা" প্রবন্ধে বাঙালি ছেলের পক্ষে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে যে অশেষ দূর্গতির শিকার হতে হয়, তার উল্লেখ করা যেতে পারে - "... ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনমতে কাজ চলে মাত্র কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে... চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে। কিন্তু এই মানসিক শক্তি হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কি করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।" রবিঠাকুরের "তোতাকাহিনী" গল্পটার মূল বক্তব্যও এখানে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বিদ্যাসাগর পরে অবশ্য 'মুগ্ধবোধ'কে পাঠক্রমের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি নোটস্ অন দ্য সংস্কৃত কলেজ (১৮৫২ সালের ১২ই এপ্রিল) নামে একটি খসড়া রচনা করেন যাতে আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষা দর্শনের সম্পূর্ণ রূপটিকে পাই। সমস্ত পরিকল্পনাটির মধ্যে একটিই সুর মূলতঃ ধ্বনিত হয়েছে সেটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।...ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন ।"[২] বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে সুন্দরভাবে সংযমিত করে 'গ্রাম্য পান্ডিত্য' ও 'গ্রাম্য বর্বরতা'র হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর খুব বেশি সাহিত্যকীর্তি না থাকলেও তাঁর বর্ণপরিচয় আজও যথেষ্ট সমাদৃত। এছাড়াও কথামালা, বোধোদয় প্রমুখ পাঠ্যপুস্তক ও শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস এইসব অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর সৃজনশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ এই ভাষার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে নবযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্ভার। এই ছিল তাঁর স্বপ্ন, আর তাই তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভালোভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ সমন্বয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিদ্যাসাগর জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের কোনও বিরোধ নেই। বিশেষ করে সংস্কৃত শাস্ত্রে যাঁর অপার পান্ডিত্য ছিল সেই তিনিই কিন্তু বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এখানে আরেকজন মহান ব্যক্তির কথা বলা যেতে পারে, তিনি রাজা রামমোহন রায়। শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট টাকায় সংস্কৃত বিদ্যালয় হচ্ছে জেনে তিনি এর বিপক্ষে লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ সালে লেখেন যে, এরকম বিদ্যালয় এদেশে আরো আছে। তাই সরকারের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবৃত্তীয় প্রমুখ শিক্ষা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের বহির্বিশ্বের জ্ঞানের সহায়ক হবে। তিনি লেখেন, "অতএব ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের কি হবে। আমরা ইংরেজ হব না, কিন্তু আমরা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব। তবে এখন যেমন "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" তেমনটা থাকবে না।[৩] তিনি মনে করতেন যেসব নির্জীব সংস্কারের জালে আমরা আমরা বদ্ধ হয়ে রয়েছি সে বেড়াজাল ছিন্ন করে পাশ্চাত্যের মুক্ত চিন্তা বাতায়ন পথে প্রবেশ করে আমাদের বহুদিনের মরচে ধরা চিন্তাজালের কতগুলোকে দগ্ধ করবে এবং কতগুলোকে করবে পুনরুজ্জীবিত।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গড়েছিলেন তপোবনের আদর্শকে মনে রেখে। এটি কোন বাঁধা নিয়মের মধ্যে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রী তৈরীর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুশীলনের ব্যাপক ক্ষেত্র ছিল ঐ শান্তিনিকেতন আশ্রম। ১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর বারাণসী সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষ ব্যাল্যান্টাইনের শিক্ষা সংসদকে প্রদেয় রিপোর্টের উত্তরে লেখেন, "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার আমাদের প্রথম প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে।..... শিক্ষকদের এইসব গুণ থাকবে; তাঁরা নিজেদের ভাষায় সুশিক্ষিত হবেন.....দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন।[৪]

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি ২০টি আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এসবই উপরিউক্ত বক্তব্যের সাক্ষর বহন করে। এখানে মনে রাখা দরকার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনকালে তিনি বিভিন্ন সময় সরকারের আর্থিক অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তবুও তিনি তার লড়াই-এ অবিচলিত থেকেছেন। এইসব বালিকা বিদ্যালয় গুলি চালানোর উদ্দেশ্যে তিনি একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভান্ডার খুলেছিলেন। উল্লেখ্য সেখানে পাইক পাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট মানুষ নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। ছোটলাট বিডন সাহেবও মাসিক ৫০০ টাকা দিতেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, মূলতঃ নিজের জেদের এবং এইসব সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও তিনি স্কুল গুলোকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। এটা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দৃঢ়সংকল্পের দিকটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম হাতিয়ার এবং কোন কাজের চূড়ান্ত ফলাফল না দেখে তিনি কাজটি করা থেকে বিরত হতেন না। এই জেদই হয়তো পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যর্থতা ও হতাশার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

বিদ্যাসাগর যখন নারী শিক্ষা আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় এমনকি সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ব্রাহ্ম সমাজপন্থীদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমান সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হয়নি। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে - ব্রাহ্মসমাজের নবীন নেতা কেশবচন্দ্র সেন এই সময় সস্ত্রীক তাঁর কলুটোলার গৃহ থেকে পালকিতে করে

জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গিয়েছিলেন তাঁর আচার্য পদের অভিষেকের উৎসবে যোগদান করতে। সংবাদটা আগে থেকেই রটে যাওয়ায় সেই সময় কেশবচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজন ও বাইরের লোকজন তাঁর কলুটোলার বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। দিনটা ছিল ১৮৬২ সালের ১৩ই এপ্রিল এবং ভারতবর্ষের নারী প্রগতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি লাল অক্ষরে লেখা একটি দিন।

এই ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায় যে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ সমাজের মধ্যেই স্ত্রী পরাধীনতা ছিল সবচেয়ে বেশি, যা ছিল বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় এবং যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরাও এমন কি স্ববিরোধী চিন্তাজালে আচ্ছন্ন ছিলেন। বস্তুতঃ বংশগত ঐতিহ্য ও সংস্কার ও নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত সামাজিক মূল্যবোধের আদর্শ – এই দুইয়ের মধ্যে দন্দ্বই তখনকার সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর দ্বিধা ও সংশয়ের কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল, যে বাধা পেরোতে হয়েছিল দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ।

এ কথা ঠিক স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের উপযুক্ত সমর্থন না পেয়ে বিদ্যাসাগর কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। ১৮৬৭ সালের ১লা অক্টোবর তিনি বাংলার ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে -কে লেখেন, - "মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী যে কতটা আবশ্যক ও অভিপ্রেত তা আমি বিশেষভাবে জানি...দেশবাসীর বদ্ধমূল সামাজিক কুসংস্কার যদি দুর্লঙ্ঘ বাধা হয়ে না দাঁড়াতো, তাহলে সকলের আগে আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করতাম...কিন্তু যে কাজে সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন করি না তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি না।"[৫] বিদ্যাসাগর আরো লিখেছেন যে, অন্তঃপুর ছেড়ে বিধবারা যদি শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দেন তাহলে তারা লোকের কাছে অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠবে।

উইলিয়াম গ্রে -কে এই চিঠি লেখার আগেই বিধবা বিবাহ আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "...অবশেষে যখন তিনি বাল্যবিধবাদের

দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হয়। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি বর্ষনের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিদ্রোহী হইয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।"[৬]

১৮৭৭ সনের ২৭শে শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন, - "নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে..... বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ বিষয়ের জন্য সর্বশ্রান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা ।"[৭]

বলা বাহুল্য এদেশের মানুষ যে কোন কাজ করা উচিত অথবা অনুচিত - এ জাতীয় বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তিবুদ্ধির ওপর যে নির্ভর করে না বরং শাস্ত্র বচন তাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় একথা বিদ্যাসাগর খুব ভালোভাবেই জানতেন। আর তাই তাঁকে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বচনের সাহায্যে নবযুগের 'মানবমুখী যুক্তিবাদের ভিত' রচনা করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত তাঁর পূর্বে রামমোহন রায়কে আমরা সতীদাহ প্রথা নিবারণের সময় একই ভূমিকা পালন করতে দেখেছি। একথা ঠিক যে, শাস্ত্র চিন্তার মধ্যেও তাঁদের আবেদনের মূল দিকটি ছিল মানবিক যার কেন্দ্রাভিমুখে ছিল সমাজ ও সামাজিক মানুষ।

যেমন বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের শেষে লিখেছিলেন "...তোমরা মনে করো, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, ...দুর্জয় রিপুবর্ণ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্ত তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ।...যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে ।"[৮] বলাবাহুল্য,

উপরের উক্তিটি থেকে বিদ্যাসাগরের মনের সংবেদনশীলতার দিকটি ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীর কথা কিছু বলা আবশ্যক। বলা যায় জননীর চরিত্রের সঙ্গে পুত্রের চরিত্রের পার্থক্য ছিল না, তারা যেন ছিলেন 'পরস্পরের পুনরাবৃত্তি'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটা অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোন প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না।"[৯] শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র বলেছেন যে ,বিধবা রমণীদের বিবাহের পরে যাতে কেউ ঘৃণা না করে সে কারণে জননী ভগবতী দেবী এ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্রে এক পাতে ভোজন করতেন। মনে হয় বিদ্যাসাগরের চরিত্র মাতার চরিত্র থেকে সহজেই অনুমেয়। যাঁর জননী এমন দৃঢ়চেতা অথচ সহৃদয় তার পক্ষে অন্যরকম হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাসাগর যখন উইলিয়াম গ্রে -কে চিঠি লেখেন তার আগেই বিধবা বিবাহ আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে তার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই।

রবীন্দ্র চিন্তার ক্ষেত্রেও নারী মুক্তি কথাটি একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা - পরিবারে সমাজে নরনারীর সমানাধিকার, এইসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা দেখি তাঁর কৈশোর থেকে বার্ধক্য সারা জীবন ধরে। যেমন, তাঁর এই সচেতনতায় প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে": "মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাই তো স্বাভাবিক।...পুরুষেরা সমস্ত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষ্য প্রাণীর মতো অন্তঃপুরের দেওয়ালে শৃঙ্খলে বাধা আছে।...একজন বুদ্ধি ও হৃদয়বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মতো, এমনকি তার চেয়ে অধম একটা ব্যবহার্য জড় পদার্থের মতো সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিস করে তোলা...যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সুখের মধ্যে তাকে চিরস্থায়ী কষ্ট পেতে হয় তবে তাও অম্লান বদনে তার স্কন্ধে স্থাপন করা - এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়। নারী ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি এই ভাবটি রবীন্দ্র সাহিত্যে বারবার ফিরে এসেছে। যেমন "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থের "সবলা বা বীথিকা'র

'অপ্রকাশ' এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত বহন করে। নারী ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন যোগাযোগের (১৯২৯) মতো গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসেরও প্রধান অঙ্গ।

এছাড়াও 'স্ত্রীরপত্র', 'বোষ্টমী', "অপরিচিতা" "পয়লা নম্বর", "হৈমন্তী'র মতো গল্পগুলি তখনকার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে এক প্রকার কষাঘাত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য নাট্যের বহু উদ্ধৃত উক্তিটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য: - "আমি চিত্রাঙ্গদা।

দেবী নহি, আমি নহি সামান্য রমণী।

পুজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নহি।

অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।

..... যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী, আমার পাইবে

তবে পরিচয়।"[১০]

নারী প্রগতি যে নারী শিক্ষার পথ বেয়েই আসা সম্ভব এ কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে তাঁর লেখায়। তিনি বলেছেন, ".... নবধুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উদ্দীপ্ত করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জীবের তপস্যায়।"[১১] বিদ্যাসাগরের জীবনে ধর্মের কোন বিশেষ ভূমিকা ছিল না। বস্তুতঃ ধর্ম বিষয়ে তিনি কখনো কোন ওঁৎসুক্য প্রকাশ করেননি। ধর্মের সেইটুকু ব্যাখ্যাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন যা তার সমাজ সংস্কারের পথে সহায়ক হয়। ধর্ম যে সমাজকে রক্ষা করে না বরং ধর্মকে কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষ সমাজকে কলুষিত করে, পীড়ন করে এটা তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। ক্লাসে পড়বার সময় পন্ডিতমশাই যখন বলতেন, ঈশ্বর বোঝ তো? বিদ্যাসাগর বলতেন, "আপনিও যেমন বোঝেন, আমিও তেমনি বুঝি। পড়াচ্ছেন, পড়িয়ে যান।"[১২]

একবার বিদ্যাসাগর তাঁর জননী ভগবতী দেবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বছরের মধ্যে একদিন পুজো করে ছয় সাতশত টাকা ব্যয় করা ভালো নাকি গ্রামের অসহায় লোকদের ওই টাকা থেকে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করা ভালো। উত্তরে দেবী বলেন, গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খেতে পেলে আর পুজোর আবশ্যকতা নেই। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল বিদ্যাসাগরের মূল ধর্ম ভাব। ধর্মশাস্ত্রের প্রথার বদলে মানুষের ধর্মেই আস্থা ছিল বিদ্যাসাগরের ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনার ক্ষেত্রেও ছিল মানুষ। তাঁর ধর্ম ছিল মানবকেন্দ্রিক। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতাবাদী। ছোটবেলায় পিতা দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে উপনিষদের আবহে বড় হয়ে উঠলেও পরবর্তীকালে উপনিষদের ব্যাখ্যায় তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় স্পষ্ট। ব্যক্তি মানব থেকে পরম মানবে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টাই রবীন্দ্রনাথের মানবতার মূলমন্ত্র। সাম্প্রদায়িকতার বীজ একটি জাতির অগ্রগতির পথে কতটা ভয়ানক হতে পারে সে সাবধান বাণীর পরিচয়ও আমরা পেয়েছি তাঁর বহু রচনায় যা আজকের দিনে বড় বেশি প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন আমরা জগতের অসত্য, অন্যায় ও অপ্রেমের বিষয় চিন্তা করে পাগল হতে পারি এটুকুই আমাদের মনুষ্যত্ব। কিন্ত একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে আমরা সবাই পাগল হই না। দৈনন্দিন ভোগবিলাসের মধ্যে অন্যের সম্পর্কে ভাববার সময় বা ইচ্ছা সবার থাকে না। সমাজে এরকম ‘পাগল’ দু-একজনই জন্মান যাদের জীবন মানুষের জন্য সাধনাতেই অতিবাহিত হয়, এরা মননের দ্বারাই জীবিত থাকেন।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে যখন চারিদিকে দেখি ভোগ-লালসার হাতছানি, মানুষে মানুষে অবিশ্বাস, ধর্মান্ধতার নিষ্ঠুর বার্তা, অশিক্ষা - তখন মনে হয় এ কোন্ পৃথিবীতে আমরা বাস করছি? আমরা ভুলে যাই পৃথিবীতে যেসব মহান মানুষ তাঁদের সারা জীবন কাটিয়েছেন মানুষেরই সাধনায় তাঁদের প্রতি আমাদেরও কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার। তবে রবীন্দ্রনাথ মনে

করতেন – 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। তাঁর এ বিশ্বাসে ভর করে আমরাও আশা করব মানুষই পারবে ভবিষ্যতে অন্ধকারের বাধা কাটিয়ে একটা সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাতে যার খোঁজ আমরা পাব এইসব মহান মানুষদেরই জীবন সান্নিধ্যে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৬৬

২) রবীন্দ্ররচনাবলী, বিদ্যাসাগরচরিত, পৃঃ ৭৬৭

৩) রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রবন্ধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পৃঃ ৫৪৫

৪) বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ পৃঃ ১৮০

৫) ঐ, পৃঃ ২৩২

৬) রবীন্দ্ররচনাবলী, বিদ্যাসাগরচরিত, পৃঃ ৩৯

৭) বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ পৃঃ ২৫৩

৮) ঐ, পৃঃ ২৫৩

৯) রবীন্দ্ররচনাবলী, বিদ্যাসাগরচরিত পৃঃ ৩২

১০) ঐ, পৃঃ ৩৯

১১) রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রবন্ধ কালান্তর: "নারী" পৃঃ ৬২১

১২) প্রবন্ধ চতুর্দশ, পিনাকী ভাদুড়ী, পৃঃ ২৫